Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 12–20
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

ধনপতির সিংহলযাত্রা : সময়ান্তরের ব্যঞ্জনায় ভাবনার নতুন সমিধ

রামী চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর
ই-মেইল : ramichakraborty12@gmail.com

Keyword
মধ্যযুগ, মঙ্গলকাব্য, লোকায়ত জীবন, বাণিজ্য যাত্রা, ঔপনিবেশিক জীবনবোধ, অতীত ঐতিহ্য, ভারতীয়ত্বের বোধ, যাত্রা, কথকতা, ইতিহাসের অনুসন্ধান।

Abstract
কাপড়ের ওপর সূঁচ-সুতোর বুননে যেমন নক্সা তৈরি হয় তেমনি জীবনের বাস্তবাভিজ্ঞতা থেকে জাত কথাবীজেই উপন্যাসের অবয়ব গড়ে ওঠে। লেখক তাঁর প্রত্যক্ষ এবং উপলব্ধ জীবন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তাঁর সৃষ্টির আধার নির্মাণ করেন। আর যিনি লোকায়ত জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটির অনুষঙ্গে রসনার রসদ খোঁজেন তার কাছে কখনো কখনো সময় অতীত-ঐতিহ্যের খোলস ছেড়ে বর্তমানের আঙিনায় নতুন সমিধ রূপে এসে দাঁড়ায়। তাই লেখককেও সেই প্রাচীন ঐতিহ্য রীতির কথকতায় নতুনত্বের অনুসন্ধানে ব্যপ্ত হতে হয়। আর যদি দেশজ সংস্কৃতির টানে লেখক ঔপনিবেশিক মানসিকতার দাসত্বকে অন্তর্ঘাত করে নতুন কথাবীজ নির্মাণে তৎপর হন তখন তাঁর লেখায় মধ্যযুগীয় উপাদান যে সময় এবং বিষয়বস্তুর ব্যঞ্জনায় মুখ্য আধার হয়ে উঠবে সেটাই তো স্বাভাবিক। এ প্রবন্ধেও এমনই একটি প্রয়াসের বিশ্লেষণী পাঠ তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে। রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ধনপতির সিংহলযাত্রা' আলোচ্য প্রবন্ধের বিশ্লেষিতব্য বিষয়। লেখক মঙ্গলকাব্যিক পরিসর থেকে অপেক্ষাকৃত স্বল্পালোচিত বণিকখণ্ডকেই বেছে নেন তাঁর লেখার প্রেক্ষিত রূপে। সওদাগর ধনপতি হয়ে ওঠে উপনিবেশিত শ্রেণীর প্রতিনিধি। তাঁর চারপাশের দেখা বাস্তবতার প্রেক্ষাপটেই মধ্যযুগীয় সমাজ জীবনকে প্রতিস্থাপন করেন। এ উপন্যাসে তিনি চেষ্টা করেছেন মানসিক ঔপনিবেশিকতাকে আঘাত করে তার নবনির্মাণ করতে যা শুধু লেখকের ক্ষেত্রেই নয় পাঠকের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। কিন্তু সেটা অতীত ঐতিহ্য কে বাদ দিয়ে নয়। বরং ব্রিটিশ পূর্ব ভারতের উন্নত শিল্প-সংস্কৃতি ছিল না- এই ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েই ঔপন্যাসিক মধ্যযুগীয় সমাজবাস্তবতার উপন্যাসায়নে আমাদের ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে চান। তাই ধনপতির যাত্রাকথাকে কেন্দ্র করে শুধু প্রাচীন ভারতের জনপদ-নদনদী-আহারের প্রাচুর্যই আমাদের সামনে নব কলেবরে উঠে আসে না বরং 'যাত্রা' শব্দটিকে ঘিরে মানব তথা মানবেতর প্রাণীর কথকতায় জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সুখ-দুঃখের গাথাও জীবন্ত হয়ে ওঠে। মুক্ত উপসংহার রচনা করে মঙ্গলকাব্যিক পরিণতি থেকে সরে এসে লেখক ধনপতির মধ্যে এক প্রতিবাদী সত্তার পূর্ণতা দিতে চান যেখানে দেবী চণ্ডীর আবেদনময়ী পূর্ণ মানবী রূপটিই প্রাধান্য পেয়ে যায় নিঃশঙ্কায়। আর এভাবেই সময়ান্তরের ব্যঞ্জনায় ভারতীয় কথন-কথার পাঠ অতীত থেকে বর্তমানে তার যাত্রা অব্যাহত রাখে।

Discussion

ক. লেখক পরিচিতি :

> "দুর্গা মণ্ডপে কাঁথা সেলাই করতে করতে বুড়ি পিসি আমাকে রাজপুত্র রাজকন্যাদের অনেক গল্প শুনিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ ঘরের বাল্যবিধবা পিসি রাজপুত্র রাজকন্যাদের মাছ-মাংস ইত্যাদি একশ আট পদের ভোজের ভেতর নিজের পছন্দের পুনকো পোস্ত, মোচার ঘন্ট ইত্যাদি অবলীলায় ঢুকিয়ে দিত। রাজপুত্রের পক্ষীরাজ ঘোড়ার ঘাস থেকে বেশ খানিক তুলে রাখতো নিজের রুগনো বাছুরটার জন্য। পিসির কথনে কারিকুরি আমার অগম্য, কিন্তু চেষ্টা তো করা যায়।"[১]

-সত্যি তাই। সেই চেষ্টাই তিনি করে চলেছেন কথাসাহিত্যের নবনির্মিত ধারায়। কাঁথার প্রতিটি ফোঁড়ে যেমন গল্পের জন্ম হয়, ব্রাহ্মণ ঘরের বাল্য বিধবা এক নারীর গোটা জীবনাবর্তেও যে এরকম অসংখ্য গল্পের বীজ ছড়িয়ে থাকে। তার আজন্ম ত্যাগ তিতিক্ষা, ভোগবতী জীবনের প্রতি উদাস দূরের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা আসক্ত লিপ্সা কিংবা প্রাপ্য জীবনের ফাঁক-ফোকরগুলোকে বাস্তবে না হলেও কল্পনায় ভরিয়ে দিয়েই সেই কাহিনির কথাবীজ গড়ে ওঠে। লেখক আসলে সেই বিক্ষিপ্ত বীজগুলোকেই কথনের কারিকুরিতে মহীরুহ করে তোলেন। তিনিও তাই করে চলেছেন। গ্রামের লাইব্রেরিতে আশৈশবের পাঠাভ্যাস, লিখন প্রচেষ্টা আর সে সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং উপলব্ধ প্রতিটি উপাদানকেই মানবজীবনের পরিক্রমায় সংশ্লিষ্ট করে দেওয়ার মধ্যেই তিনি সৃষ্টির বীজ খোঁজেন। তাইতো তাঁর দৃষ্টি বারবার এক পদক্ষেপ এগিয়ে দু পদক্ষেপ পিছিয়ে যেতে চায়। বারবারই রামায়ণ গান, মনসা গান, গাজন, ঝাঁপান, পাঁচালী কথকতায় জীবন খুঁজে ফেরে। মাঝে মাঝে সেই আকাঁড়া শৈশবের অনুষঙ্গ, তাঁকে ঘিরে থাকা প্রতিটি অখ্যাত অজ্ঞাত মানুষগুলি তাঁর আখ্যানের চরিত্র কিংবা উপাদান হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। যিনি অবলীলায় বলতে পারেন,

> "মঙ্গলাপিসি, দখিমাসি, টেলু চক্রবর্তী, ফেঁতিরাণিদের নিয়ে আমার গল্পের জগৎ তাদের অবলীলায় আসা-যাওয়া ছিল রাজা রানীর গল্পে, ব্রতকথায় রামায়ণ গানে, কৃষ্ণ কথায়। ...কিছু নাগরিক গল্পও আছে, কিন্তু সে আসলে নিজের দিকে ফেরা, কর্ম ফেরে যাদের সঙ্গে বসবাস তাদের কথা বলা।"[২]

'কর্মফেরে' যাদের সাথে দিবারাত্র কাটাতে হয়, তাদের কথা তো চলেই আসে অনায়াসে। কিন্তু জীবন তরীটি যে বন্দরে মাল বোঝাই করে পাড়ি জমায় গন্তব্যের উদ্দেশ্যে সেই সব উৎস কথাই যে ভিত তৈরি করে দেয়। সেই দেশজ-ঐতিহ্যের দিকে ফেরাই যে আসল ফেরা। কেননা এ দায় যে জীবন দিয়ে মিটিয়ে যেতে হয়। সত্যের কাছে নতজানু থেকে সেই দায়ভারকেই তুলে ধরেন তিনি তাঁর লেখায়। নগরে থেকেও যাঁর কলম গ্রামীণ ঐতিহ্যে খুঁজে ফেরে তার সৃজন ঠিকানা। এই নগর বাউল মানুষটিরই একটি বহুপঠিত উপন্যাস এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। আর সেই উদ্দিষ্ট 'নগর-বাউল' লোকটি আর কেউ নন, তিনি রামকুমার মুখোপাধ্যায়। রামাঙ্গমোহন মুখোপাধ্যায় এবং কনকলতা মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র রামকুমারের জন্ম ১৯৫৬ সালে কলকাতায়। যদিও পিতৃনিবাস শ্যামবাজার-বউবাজার এলাকায় কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর স্বাভিমানী মাতার আগ্রহে তারা পিতৃপুরুষের ভিটে বাঁকুড়ার গেলিয়া গ্রামে বসবাস করতে শুরু করেন। হয়তো এই সিদ্ধান্তই রামকুমারের হয়ে ওঠার পথকে প্রশস্ত করেছিল। গ্রাম জীবনের সান্নিধ্য তাঁর পরবর্তী লেখক জীবনকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। গ্রামীণ স্কুলে পাঠ গ্রহণ সম্পন্ন করে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে ভর্তি হন এবং পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ার জন্য ভর্তি হন। সম্ভবত সেই সময়ই তাঁর লেখালেখিরও সূত্রপাত। তাঁর প্রথম গল্প 'বেলুন' যা পরে 'দিশারী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মাদলে নতুন বোল'। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'চারণে প্রান্তরে', (১৯৯৩)। তাছাড়াও 'দুখে কেওড়া', 'ভাঙা নীড়ের ডানা' (১৯৯৭), 'মিছিলের পরে' (১৯৯৮), 'ভবদীয় নঙ্গরচন্দ্র' (২০০৬) 'কথার কথা' (২০০৮), 'ধনপতির সিংহলযাত্রা' (২০১১) ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তবে 'ধনপতির সিংহলযাত্রা' উপন্যাসটি রামকুমারের সৃষ্টিচেতনাকে অন্য মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করে। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হওয়ার সুবাদে ১৯৩৬ সালে কবিকঙ্কন মুকুন্দকে নিয়ে লেখা সুকুমার সেনের একটি ইংরেজি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ভার তাঁর ওপরে পরে। এবং তখন থেকেই মঙ্গলকাব্যের প্রতি আকর্ষণ তাঁর ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

কেননা উপরে উল্লিখিত উপন্যাসটি রচনার আগেই এই বিষয় নিয়ে তাঁর অন্যান্য লেখাগুলো ক্ষেত্র প্রস্তুতি হিসেবে তাঁকে সহায়তা করেছে। ১৪০৪-০৫ বঙ্গাব্দে লিখিত 'লহনা-খুল্লনা' উপন্যাস কিংবা ১৪০৯ বঙ্গাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'কালিদহ' গল্পটি এর অন্যতম নিদর্শন। শুধুমাত্র উপন্যাস নয় 'পরিক্রমা', 'শাঁখা' ইত্যাদি গল্প গ্রন্থেরও রচয়িতা তিনি। শিক্ষকতার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি। পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার সাথেও যুক্ত ছিলেন। ১৯৮৯ সালে সাহিত্য অকাদেমিতে যোগদান এবং দীর্ঘ দুদশকেরও বেশি সময় ধরে এই কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বৃহত্তর ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁর সংযোগ সূত্রকে আরও দৃঢ় করে। এই সংযোগ-সূত্র তাঁর লিখন বিশ্বকে কতটা প্রভাবিত করেছিল এই অনুভবকে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন,

> "১৪১৪-তে ১৮টি ভাষায় ৪৫টি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতজোড়া গল্পকথা' এবং ১৪১৮তে ৫২টি ভাষায় ১২৮টি লোকগল্প নিয়ে প্রকাশিত পায় 'ভারতজোড়া কথনকথা'। ২৫টি ভাষায় ৬০জন কবির প্রায় ৩০০টি কবিতা নিয়ে এবার প্রকাশিত হল 'ভারতজোড়া কাব্যগাথা'। এই ত্রয়ীর মধ্য দিয়ে সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় আমার ভারতীয় সাহিত্য পরিক্রমা সম্পূর্ণ হল।"[৩]

যতই সময় গিয়েছে মৌলিক কথনরীতি এবং অভিনব বিষয়বৈচিত্র রামকুমারের লেখার জগৎকে সমৃদ্ধ করেছে এবং পাঠক মহলে তাঁর স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর স্বীকৃতি স্বরূপ অনেক পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন তিনি। 'সোমেন চন্দ স্মৃতি পুরস্কার', 'বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার', 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার', 'গজেন্দ্রকুমার মিত্র শতবার্ষিকী স্মারক পুরস্কার', ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২০১৩ সালে 'ধনপতির সিংহলযাত্রা' উপন্যাসটির জন্য 'আনন্দ পুরস্কার'-এ ভূষিত হন তিনি। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের সুবাদে ভ্রমণ-কাহিনিও রচনা করেন তিনি। 'নতুন চীনে' (২০০২) এবং 'ওই বাংলায়' (২০০৩) তাঁর লেখা এ ধরনের দুটি ভ্রমণকাহিনি।

বাল্যকাল থেকেই গল্প শুনে গল্প বলার অর্থাৎ সৃষ্টির সংশ্লেষণী গুণটি সহজেই আয়ত্ত করে ফেলেন রামকুমার। তাই দিবাকরের পিসি, হাঁড়ু চক্রবর্তী, টেলু চক্রবর্তী কিংবা পারিবারিক জীবনে নিজের মা এবং দিদিমা অনায়াসেই তাঁর লেখার রসদ সংগ্রহে হয়ে ওঠেন নেপথ্য জোগানদার এবং তাদের কাছেই কথন শিল্পের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে ওঠেন। তাঁর রচনায় লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতির প্রাধান্য কথকতার হারিয়ে যাওয়া পুরোনো রীতিকে ফিরিয়ে এনে দেশ-জাতির মূল ঐতিহ্য সন্ধানে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা তাঁর মৌলিকতাকেই চিহ্নিত করে,

> "লেখার পর্বে লেখক যদি তাড়িত হয় তাহলে পাঠকও আলোড়িত হবে। আমার বিশ্বাস এটি একটি রিলে রেস।"[৪]

খ. বিশ্লেষণ :

এ প্রবন্ধের আলোচ্য উপন্যাস 'ধনপতির সিংহলযাত্রা'। ২০১৩ সালে এ উপন্যাসের জন্য তিনি 'আনন্দ পুরস্কার' লাভ করেন। শুধু তাই নয় এ উপন্যাস কথন-শিল্পী রামকুমারের স্বাতন্ত্র্যকেও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। বিষয়বৈচিত্র থেকে কথন-ভঙ্গির অভিনব শিল্পিত প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে রামকুমার মুখোপাধ্যায়কে একটি স্বতন্ত্র অবস্থানে অধিষ্ঠিত করেছিল, আলোচ্য উপন্যাসটি এর যথার্থ প্রমাণ। এ উপন্যাসের নিবিড় আলোচনায় যাওয়ার আগে লেখকের অভিপ্রায় সম্পর্কে জেনে নেওয়া যেতে পারে,

> "আমি উপনিবেশ-পূর্ব বাংলার সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে চেয়েছি এই উপন্যাসে। গঙ্গার দু'ধারে যে জনপদগুলো ছিল তাদের নামের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সম্পর্ক ছিল। হালিশহর, নবদ্বীপ, ললিতপুর, ইন্দ্রানী ইত্যাদি নামের পুরাণ ইতিহাস আমরা ভুলে গিয়েছি। ঔপনিবেশিক শাসনে হারিয়ে গিয়েছে প্রাচীন বাংলা ও বাঙালির অনেক পুরানো খাবার। ধনপতি-তে সেই যুগটাকে আমি নতুন করে নির্মাণ করতে চেয়েছি। ভাঙতে চেয়েছি আমাদের মানসিক ঔপনিবেশিকতাকে।"[৫]

উপরে উল্লিখিত মন্তব্যটির দুটো অংশের দিকে যদি আমরা একটু বিশেষ দৃষ্টি দিই তাহলে সম্পূর্ণরূপে না হলেও আমরা লেখকের শুধু এক্ষেত্রেই নয়, কলম-চারণার নেপথ্য উদ্দেশ্যটিও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ প্রতিটি উপন্যাস হয়তো ভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে কিন্তু তা গড়ে ওঠার নেপথ্য কারিগর কিন্তু সেই একজনই। তাই তাঁর

জীবনবোধের সংজ্ঞাটি প্রতিনিয়ত বদলে যায় না বলেই আমরা খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও যদি একজন লেখকের রচনা-কর্মের নিবিড় অবলোকন করি, তাহলে সেসব রচনা গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে আছে যে অদৃশ্য সুতোর বাঁধনে তা উপলব্ধি করতে পারি। রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও এই ধারণাটি পোষণ করতে চাইছি আমরা। আলোচ্য উপন্যাস রচনার পেছনে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন তিনি, তাতে দুটো কথার ওপর জোর দিতে চাই। প্রথমত উপনিবেশ-পূর্ব ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করানো আর দ্বিতীয়ত মানসিক ঔপনিবেশিকতাকে ভেঙে তা থেকে বেরিয়ে আসার প্রস্তুতি। এক্ষেত্রে আবারো ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে প্রাবন্ধিক-লেখক দেবেশ রায় ঔপন্যাসিকের শিল্প সংকটের কথা বলতে গিয়ে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন তা, -

> "যে কোনো কলোনির প্রজা হিশেবে কলোনির কোনো শিক্ষা তার বাক্যের ভিতরে ভরে দেবে না। আমি এমন একজন ঔপন্যাসিকের কথা ভাবছি যে আজ বা আগামীকাল চাইতে পারে- সে স্বাধীন, তার লেখা স্বাধীন ও সেই লেখায় নিহিত অর্থও স্বাধীন।"[৬]

তাহলে সেই স্বাধীন কথাগুলো বলতে হলে স্বাধীন মনের মানুষ হতে হবে। এই 'স্বাধীন মনের মানুষ' বিশেষণটিকে যদি সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে ঠিক তার বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে যে ঔপনিবেশিক মন বা মনের ঔপনিবেশিকতা- এই শব্দটির অর্থও বোঝা যাবে। এই মনের ঔপনিবেশিকতার স্বরূপটিকে বুঝতে তার গড়ে ওঠার প্রেক্ষিতটি সম্পর্কে দু-চার কথা সংক্ষেপে বলে নিতে হয়। আমরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির অধীন ছিলাম দীর্ঘদিন। এবং সেই ঔপনিবেশিক শাসনকালে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিকাশ ধারাকে বোঝার পাশাপাশি আমাদের বৌদ্ধিক চিন্তার জগৎও গড়ে উঠেছিল। সমস্ত বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিকের বিকাশ ঘটেছিল আসলে এই ঔপনিবেশিক শাসনামলেই। ফলে যে ঔপনিবেশিক মানস আমাদের শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায় তা হলো ব্রিটিশ পূর্ব ভারতে কোনও উন্নত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল না। ফলে রাজনৈতিকভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির কবল থেকে আমাদের মুক্তি মিললেও মননে দীর্ঘ লালিত এই বিশ্বাস থেকে মুক্তি মেলেনি। ফলে কলোনিয়াল শাসনের পরবর্তী সময়েও সবার মধ্যেই এক ধরনের প্রতীচ্যের অনুকরণ স্পৃহা তীব্রভাবে থেকে যায়। পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদী মানসিকতার আনুগত্য স্বীকার করে নিই বিনা প্রশ্নেই। এই বিনাপ্রশ্নে আনুগত্য স্বীকার করে নেওয়ার প্রবণতাকেই ঔপনিবেশিক মন বা মনের ঔপনিবেশিকতা বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। ফলে বলতে দ্বিধা নেই "আর কতটা ইউরোপীয় হওয়া গেল তার মধ্যেই নিহিত হল আধুনিকতার চিন্তা।"[৭]

ফলে এসময় থেকেই আমরা আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায়ে কিছু আরোপিত ভাষাকেই নিজস্ব বলে মানিয়ে নিয়েছি নিজেদের ভাষা ভুলে গিয়ে। প্রাবন্ধিক-লেখক দেবেশ রায় এই প্রসঙ্গেই তাঁর উপন্যাস সম্পর্কিত ভাবনাকে ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন,

> "বাক্ আর অর্থের মধ্যে ঔপনিবেশিক শক্তি ঢুকে পড়ে তাদের বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে দিয়েছে। আমরা তখন থেকেই আমাদের নিজেদের কাহিনীকার হওয়ার পরিচয় হারাতে শুরু করি। আমরা ধরে নিলাম ঐ ভাষা ঐ ঘোষণার নামই উপন্যাস। ঐ ভাষা আর ঐ ঘোষণার মাঝখানের ফাঁক দিয়ে 'অর্থ' গলে গেল। ইংরেজরা আমাদের এই উপন্যাস শিখিয়েছে। আমরা আমাদের নিজেদের হারিয়ে ফেলেছি।"[৮]

আমাদেরও যে একটি নিজস্ব কাহিনি ছিল, কাহিনি বলার কথকতার ধরন ছিল; পাঁচালি, ব্রতকথা, তরজা, যাত্রা ইত্যাদি মাধ্যমে শ্রোতা এবং দর্শকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের এবং কথকঠাকুরের নিজস্ব চিন্তার অন্তর্ভূক্তিতে প্রতি বারই ভিন্ন কাহিনি তৈরি হতো। আর এভাবেই সমকালীনতার বাস্তবরূপকে তুলে ধরতেন কথাকাররা। কিন্তু আমরা ঔপনিবেশিক আমলে এসব ধরনকে বিস্মৃত হয়েছিলাম কারণ ঔপনিবেশিক আমলে আমাদের কাছে ঔপনিবেশিক প্রভুর দেখানো পথই 'শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা' পায়। এর মূল কারণটিও ঐ ঔপনিবেশিক মানসিকতার মধ্যেই নিহিত। ঔপনিবেশিক প্রভু চিরকালই উপনিবেশিত মানে তাদের অধীনস্থদের নিকৃষ্ট করে দেখাতে চায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা নিরঙ্কুশ রাখতে।

> "ইংরেজরা এইসব কাহিনির আঙ্গিকের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। আমরাও তাই আমাদের পরিচয় ভুলে যেতে শুরু করলাম। গত দশকের মাঝামাঝি যখন ডিরোজিয়ানরা বাঙালি-ভারতীয় সংস্কৃতির দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসেন, তখনই এই সমস্ত দেশী আঙ্গিক অব্যবহারে নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে।"[৯]

এই পাশ্চাত্য নির্ভর সমালোচনা পদ্ধতি, সাহিত্য নির্মাণ তাও একদিন নতুনভাবে উন্মুক্ত করতে চাইল নিজেকে। ফলে Textual criticism এবং Post structuralism যুদ্ধোত্তর পরিবেশে নতুনভাবনার উদ্রেক করেছিল। লেখক-শিল্পীকেও তাই নতুন অর্থের খোঁজে যেতে হলো। তাই এতদিন যে বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতি-কৃষ্টি-ঐতিহ্য-ধর্মাচরণ-লোকায়ত সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে ইউরোপীয় চিন্তাবিদের কথাই ছিল শেষ কথা। প্রাচ্য তত্ত্ববিদ এডোয়ার্দ সাঈদ সেই প্রাচ্যের মানুষদের ঔপনিবেশিক মনোজগতে অন্তর্ঘাতের মাধ্যমে কেন্দ্রচ্যুতির কথা বললেন।

> “ফলে আধুনিক সমালোচনা পদ্ধতির বিরুদ্ধেই প্রথম অভিঘাত এবং ঔপনিবেশিক মানসিক সংস্কার ভেঙে নতুন বোধে উজ্জীবিত হতে সারা বিশ্বকে প্রাণোদনা যুগিয়েছেন।”[১০]

আলোচ্য উপন্যাস রচনার পেছনে সুপ্ত অভিব্যক্তির কথা বলতে গিয়ে লেখক যে কথাগুলো বলেছিলেন তার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি এতোক্ষণ আলোচনায় বোঝাবার সংক্ষিপ্ত প্রয়াস করা হয়েছে। এবং প্রথম উদ্দেশ্যটির পেছনে অন্তর্নিহিত কারণটিও স্পষ্ট করা গেছে সম্ভবত। ঔপন্যাসিক রামকুমার আসলে চণ্ডী-পুরাণের আখেটিক খণ্ডের চেয়ে জনপ্রিয়তার দিক থেকে তুলনামূলকভাবে নিষ্প্রভ বণিকখণ্ডের ঘটনা-পর্বেই নিজের লেখার ছক খুঁজেছিলেন যে কারণে তা হল সেই উপনিবেশ-পূর্ব বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের পরিচিতিকরণই নয় শুধু, দেশজ ঐতিহ্য-ইতিহাস আবিষ্কারে নিজস্ব অস্তিত্ব-সংস্কৃতিরও অনুসন্ধান। উত্তর-আধুনিক চিন্তা-চেতনার মূল অন্বিষ্টকে বয়ান করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক সমালোচক এজাজ ইউসুফীও বলেছিলেন,

> “এটি ঐতিহ্যের প্রতি সাদামাটা স্রোত মাত্র নয়, নিশ্চিতভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত ইতিহাস চেতনার সারাৎসারও। শুধুমাত্র অতীতের দিকে ফেরা নয়, অতীতের আলোকে বর্তমানকে পুনর্গঠন। যা অতীতকে সমকালীন বোধে সিক্ত করে।”[১১]

এবার উপন্যাসের দিকে ফিরে দেখা যেতে পারে। ঔপন্যাসিক বণিকখণ্ডের মূল ঘটনার সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেননি। তাঁর নির্বাচিত অংশটি হলো বণিকখণ্ডের প্রথম অংশটি। অর্থাৎ সওদাগর ধনপতির সিংহলযাত্রার প্রস্তুতি থেকে সওদাগরের সিংহলে বন্দিদশা পর্যন্ত। আবার এটাও সত্য, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একালের সাহিত্যিকগণ মিথ-পুরাণের ভাঙা গড়ায় যে নবনির্মাণ করেন ঔপন্যাসিক রামকুমারের সেটা অভিপ্রেত ছিল না। কেননা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তিনি ঘটনা কিংবা চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে সমকালীনতার সঙ্গে যুক্ত করতে চাননি। বরং চেয়েছিলেন ইতিহাস-ঐতিহ্যের পুরনো অবয়বেই ভাবনার নতুনত্ব বা মৌলিকতাকে তুলে ধরতে। যশস্বী সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তীর কথা ধার করেই বলি যে মহাভারতের ব্যাসদেবের বর-পুষ্ট সঞ্জয়ের প্রত্যক্ষ দর্শনের দিব্যদৃষ্টির মতো ঔপন্যাসিক রামকুমারও “মুকুন্দের কাব্য সামনে রেখে কয়েক শতাব্দীর দূরত্ব থেকে ফিরে দেখেছিলেন মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালিকে।”[১২]

এই সময়ে দাঁড়িয়ে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বাংলা ও বাঙালি তার ঘর-বাড়ি, আহার বাণিজ্য, কৃষ্টি, সংস্কার ইত্যাদি রাজার সঙ্গে প্রজার, সাধারণ মানুষের সঙ্গে অপর মানুষের সম্পর্ক, নদ-নদী, হাট-গঞ্জ-প্রকৃতি-লোকায়ত জীবন-গীতবাদ্য সমেত পটচিত্রের মতো তাঁর লেখায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। এ উপন্যাসের মূল অভিনিবেশ বিন্দুগুলোকে যদি সুত্রায়িত করা যায় ব্যক্তিগত পাঠের নিরিখে, তাহলে এভাবে দেখানো যেতে পারে,

ক) প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালির নৌ-বাণিজ্যের প্রভূত বিস্তার।

খ) প্রাচীন যুগের বিস্মৃত অথচ সমৃদ্ধ জনপদ-নদ-নদী-স্থানের পরিচিতিকরণ।

গ) লোকায়ত সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার।

ঘ) সভ্যতার বিকাশে সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মানবসত্তার জয়যাত্রার ইতিহাসের অব্যাহত ধারা।

ঙ) সর্বোপরি ভারতীয়ত্ব বোধের বিকাশে বাংলার আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক চেতনার বিস্তার।

সাহিত্যে প্রান্তিক এবং এছাড়া অন্যান্য বর্গের মধ্যে সংকটের অবস্থান নিয়ে আলাপচারীতায় রামকুমার জানিয়েছেন যদিও সাহিত্যে প্রান্তিক বর্গের উঠে আসাটা একটি বিশেষ সময়ের নিশ্চিত চাহিদা ছিল কিন্তু সংশয় সংকটের মধ্য দিয়ে সবাইকেই যেতে হয় জীবনের আবর্তে। তাই তো তাঁর লেখায় অবস্থাপন্নের কথাও উঠে আসে।

> “যেমন আমার ভবদীয় নঙ্গর চন্দ্র-উপন্যাসের নঙ্গর চন্দ্র অবস্থাপন্ন চাষি। আর ‘ধনপতির সিংহলযাত্রা’য় তো সপ্তডিঙ্গা ভেসে চলেছে ধন-সম্পদে পূর্ণ হয়ে। ‘চন্ডীমঙ্গল’ এর কালকেতু উপাখ্যান বেশি জনপ্রিয় হলেও আমি ধনপতির উপাখ্যান বেছেছি নদী সমুদ্র বেয়ে, বিপদসঙ্কুল জলযাত্রার কথা ভেবে।”[১৩]

তাহলে বোঝাই যাচ্ছে বহুপঠিত কাহিনি নিয়ে অনায়াসে জনপ্রিয়তা অর্জন এবং স্বীকৃতি কুড়োনোর আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিলনা। পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রাচীন ভারতের এই বাণিজ্য সম্পর্কে জানা যায় ঐতিহাসিক প্লিনি এবং মার্কোপোলোর ভ্রমণবৃত্তান্তে। ভারতীয় বণিককূল নৌচালনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ফা-হিয়েনের মন্তব্যানুসারে সর্বাধিক দুশোর বেশি যাত্রী বহনের ক্ষমতা নিয়ে ভারতীয় জাহাজ চলাচল করত। বণিকদের কষ্টবহুল বাণিজ্য যাত্রার ছবিও বিভিন্ন গ্রন্থ যেমন- 'মিলিন্দ পঞ্চ্‌ হো', 'দশকুমার চরিত' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে পাওয়া যায়। সেকালের ভারতবর্ষের প্রধান দুটি বাণিজ্য বন্দর হিসেবে 'চম্পা' আর 'তাম্রলিপ্তি' নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভৃগুকচ্ছ, পাটল, সুপারা ইত্যাদি বন্দর থেকে ভারতীয় বণিকদের সিংহল, রোম প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য উদ্দেশে যাত্রার কথা শোনা যায়। আর্য সভ্যতার বিস্তারকালে গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চল তাম্রলিপ্ত এবং চম্পা নগরের নাম উঠে আসতে দেখা যায়। সেকালে জাহাজ নির্মাণ পদ্ধতিতে লোহার পেরেকের পরিবর্তে নারিকেল দড়ির ব্যবহারের কথা জানা যায়। আমরা আলোচ্য উপন্যাসেও দেখি রাজার নির্দেশে যখন ধনপতির সিংহল পাটনে যাত্রা প্রায় অবধারিত 'মধুকর', 'দুর্গাবর', 'শঙ্কচূড়', 'চন্দ্রপাল', 'ছোটোমুঠী', 'গুয়ারেখি' ও 'নাটশালা'- এই সপ্তডিঙার উত্তোলন নিশ্চিত হয়। প্রতিটি ডিঙার নির্মাণ শৈলী এবং নির্মাণে ব্যবহৃত কাঠের নানা রূপের বর্ণনা রয়েছে। প্রতিটি ডিঙা বিভিন্ন দ্রব্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং এদের বিশেষত্বও ভিন্ন। গাম্ভীর এবং ডহ দারু নির্মিত জলযান 'দুর্গাবর' সওদাগরের ডিঙা। এই নামের প্রতিটি অক্ষর বিন্যাসে একটি বিশ্বাস জড়িত।

> "দুর্গার দ-কারে দৈন্য নাশ, উ-কারে বিঘ্ন নাশ, র-কারে রোগ নাশ, গ-কারে পাপ
> নাশ, ও আ-কারে ভয় শত্রু নাশ-দুর্গাস্মরণে সাগর পথ নিরাপদ।"[১৪]

গাবরদের জন্য নির্ধারিত যে জলযানটি তা হলো নাটশালা। এই অনির্দেশ্য যাত্রাপথেও যাতে জীবনে রঙ্গ-কৌতুক বজায় থাকে, তার প্রস্তুতি। নৌকা যেসব বিনিময় দ্রব্যে ভরে ওঠে তা সংগ্রহ করে বাংলার মানুষ। তাতে যেমন রয়েছে প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন আহার-দ্রব্য, তেমনি রয়েছে নানা জাতের পাখি শস্য ইত্যাদি।

> "উজানি নগরবাসী, ত্বরা ভ্রমরায় চলো। সপ্তডিঙা ভরো আপন পণে।"[১৫]

আহার্য দ্রব্যের মধ্যে পলাঙ্গু, কোলকন্দ, ভল্লাতক, হরিদ্রা, লবঙ্গ, নারিকেল, আম্রাবর্ত, পক্ষীকূলে থুড়িমারা, সেতা, নেতা ইত্যাদি পারাবত, সালিকা, পাটলা, রতিভূরা ইত্যাদি নানাজাতের পাখির বর্ণনা রয়েছে। অর্থাৎ জীবনধারণের ক্ষেত্রে আহার্য থেকে শৃঙ্গার এবং প্রতিষেধক সব ধরনের বিনিময় দ্রব্যে ভরে ওঠে ধনপতির ডিঙাসপ্তক। এসব দৃশ্যে এক সমৃদ্ধ জনপদের যাপনের ছবিই ফুটে উঠেছে। সে সঙ্গে সপ্তডিঙার অতিক্রান্ত পথে আমাদের পরিচয় ঘটে বিভিন্ন প্রাচীন গ্রাম-জনপদের সঙ্গে যেমন 'ডাহিনে ললিতপুর বামেতে ইন্দ্রানী'। ভ্রমরা-অজয়-ভাগীরথী-দামোদর-গোদাবরীর যাত্রা শেষে সাগরসঙ্গমে উপনীত ধনপতির বাণিজ্যতরী। এবার যাত্রার পথ আরও প্রশস্ত এবং বিপদসঙ্কুল। নদীপথে যাত্রাকালে ধনপতির ডিঙা একে একে পেরিয়ে যায় ডুমরা, বালিয়া, নতুনগাঁও, দুমদা, চামকরা ইত্যাদি জনপদ। শুধু প্রাচীন দ্রব্যের বর্ণনা নয় রন্ধনশিল্পের ক্ষেত্রেও অনেক প্রাচীন রান্নার পদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। এতকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা সম্ভব নয় কেননা সত্যি অর্থেই এ উপন্যাসটি শুধু অনির্দিষ্ট এক অভিযাত্রীর নির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রাই নয়; উপন্যাসটির কথকতার যে ফর্মকে আত্তীকৃত করে এগিয়ে গেছে তাকেও কথাযাত্রা বলা যেতে পারে। এতেও রয়েছে হাজারো বাঁক ফেরা, আবার সেই বাঁক থেকেই জন্ম নিয়েছে আরো নতুন কথাবীজ। এ যেন কোনও এক বিন্দু থেকে শুরু করে ক্রমাগত কথার আরও বৃত্ত-উপবৃত্ত-শাখাবৃত্তে ছড়িয়ে যাওয়া, ফিরে আসার ভাবনাটাই অমূলক; শুধু চরৈবেতি - সামনের গন্তব্যে পৌঁছানোর প্রয়াস। ভারতীয় উপনীষদীয় দর্শনও তো তাই বলে। পেছনে ফেলে যাওয়া পথ এবং সময় দুটোই যেন যাত্রা পথে অন্তরায় তৈরি করে।

এক অর্থে কী অনির্দেশ্য জীবনের যাত্রাপথের ছবি ফুটিয়ে তোলেন নি ঔপন্যাসিক ধনপতির যাত্রাপটে একজন দক্ষ পটুয়া শিল্পীর মতো! 'যেতে নাহি দিব তবু যেতে দিতে হয়' এটাই যে জীবনের ধ্রুব সত্য। ধনপতিও করজোড়ে উজানী নগরের শান্ত গৃহকোণ ভিক্ষে চেয়েছিল রাজশক্তি বা নিয়ন্ত্রকের কাছে। কিন্তু সেটা ঘটে নি। কারণ নিয়ন্ত্রক অর্থাৎ রাজার

আকাঙ্ক্ষার প্রাপ্তিই যে শেষ কথা তাই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলতে থাকে এই যাওয়া আসার পালা। প্রথমে জয়পতি দত্ত পরে তার পুত্র ধনপতির পালা। যাত্রাকালে একের পর এক অভিনব সৌন্দর্যে যেমন আবিষ্ট হয় ধনপতির মন তেমনি বিপদসঙ্কুলতাকেও পেরিয়ে যায় সে। জীবনের পথ যে কুসুমকোমল নয়। এই দার্শনিক বীক্ষাটুকুও এই উপন্যাসের ভিন্ন সংযোজন।

আমরা উপন্যাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এমন কিছু দৃশ্যের মুখোমুখি হই যেখানে আমরা দেখি মানবেতর কিছু প্রাণীর কথোপকথনে এই পার্থিব মানব জীবনের সুখ-দুঃখ-সংরাগ-প্রেম-ত্যাগ-বিচ্ছেদ-বিরহ-মৃত্যুর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। দু একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে।

> "কথায় কথায় রাত্রি বাড়ে। গপ্পো কথা ততক্ষণে নিদ্রায় বেসামাল। মস্তক দোলে বাঁশরি মাতন ফণীর মতো। গাভি নদী জলের হৈমন্তিক গাঢ়তার কথা ভুলে ভ্রমরার তীরে পৌষসংক্রান্তির মহোৎসবের কথা বলে। গাছের পক্‌খি গ্রহ রাজির ফল ছেড়ে আকাশের তারকা গোনে। খেতের লাঙ্গলা হলধরের পত্নীর পরিবর্তে নিজ সহধর্মিনীর সাধ ভক্ষণের দিন গোনে। দধিকর দধিভান্ডগুলি বৃক্ষতলে রেখে দধিত্থ বৃক্ষে চড়ে কপিদের সঙ্গে রামচন্দ্রের সিংহল যাত্রার গপ্পো জোড়ে। তখনই দূরে জাগে আলোকমালা। সে আলো ভ্রমরার স্রোতে ভাসে, দোল খায়, বয়ে নিয়ে আসে ধনপতির সিংহলযাত্রার বার্তা এক জনপদ থেকে আর এক জনপদে। নেভানো পিদিম আবার জালায় বউ ঝিরা, গাভি গোশালা ছেড়ে বাইরে আসে, গাছের পক্‌খি নতুন জোনাক গাঁথে গোময়ে, শিকার সন্ধানী শার্দুল থমকে দাঁড়ায়, শিবা ভ্রমরার স্রোতের কেরয়াল ধ্বনি শোনে, মীন সুবাস নেয় ডিঙা দারু গাম্ভীর, ডহু, পনস, পিয়ালের।"[১৬]

ধনপতির সিংহলযাত্রা এখানে প্রতীকী হয়ে উঠেছে। একদিকে এ যাত্রা যেন মহোৎসবের বার্তা বয়ে আনে। সওদাগর ফিরে এলে তার সাথে আসবে বিত্ত-বৈভব-সমৃদ্ধির পাশাপাশি সুখের আনন্দের সুপবন। এই শুভক্ষণটিকে সবাই মুখর করে রাখতে চায়। ঔপনিবেশিক সময়প্রবাহে যখন আমরা নিজেদের সংস্কৃতিকে ভুলে গিয়ে প্রতীচ্যের অনুকরণকেই একমাত্র সভ্যতার মানদণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে চলেছি তখন পুরনো দেশজ ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে ঔপন্যাসিক যেন সাংস্কৃতিক আধিপত্যের অন্তর্নিহিত অর্থকে এভাবেই অন্তর্ঘাত করতে চান এবং আমাদের চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে চান দেশজ ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়ে। ধনপতির সিংহলযাত্রার বার্তা যেমন জনপদ থেকে জনপদে বয়ে নিয়ে যাওয়ার দায় বহন করে মানুষ-মানবেতর প্রাণী, এমনকি প্রাকৃতিক প্রতিটি উপকরণ; আমাদের শেকড়ের কথাকেও যে এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে নিয়ে যাওয়ার দায় আমাদেরই। তাই এ উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লোকসংস্কৃতির হাজারো প্রসঙ্গ জড়িয়ে রয়েছে। চিঁড়া, দই, ফেনি, ঘৃতে ভাজা পলাকড়ি, মুগসূপ, জিরা সন্তলনে বাগ্যান - সাড়ি কচু ও খাম-আলুর ব্যঞ্জন ইত্যাদি ফলাহার এবং নানা ব্যঞ্জনের কথা বলেছেন লেখক। কুড়ঙ্গ (হরিণ), মাতঙ্গ (হাতি), তরক্ষু (নেকড়ে বাঘ) ইত্যাদি বাংলার পশুর কথা যেমন রয়েছে তেমন উলুক, চন্দনা, পিক, থুড়িমারা, শিখরিয়া, মনসুখা, দোষল ইত্যাদি পাখিরও উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয় বাংলার ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে যেসব বৃক্ষরাজি - যেমন কালচিত, আতয়ি, মাকন্দ বৃক্ষ, দধিত্থ বৃক্ষ, কামরাঙ্গা বৃক্ষ; যেসব ফুল যেমন ভূমি চম্পা, বিসসোলা, বাকসনা নাগকেশর, স্বর্ণযুথিকা এবং ফল যেমন মাকন্দ, রম্ভা, কদলী, টাবা ইত্যাদির উল্লেখও রয়েছে। লোকসাহিত্যের স্বর্ণভান্ডারকে পূর্ণ করেছে যেসব ধাঁধা প্রবাদ ইত্যাদি সেই ধাঁধার ব্যবহারেও বাংলার লোক জীবনের ঐহিক ছবি উঠে এসেছে। লোকবিশ্বাসের ব্যবহারও লক্ষনীয়। আমরা দেখি সংস্কারে বিশ্বাসী গণক খড়িবজ্র খাঁকে যাত্রাপথের শুভাশুভ বিচারে ধনপতিকে এসময়ে যাত্রা করতে নিষেধ করতে। সবশেষে উল্লেখ করতে হয় গানের কথা। নদীমাতৃক অঞ্চলের প্রতিটি জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে নদী-জলের বাস্তবতা। কূল ভাঙা নদী আর মন ভাঙা নারীর অবস্থান যে প্রায় এক। তাই তো এই বেদনার শোকার্ত সুরে বেজে উঠেছে চিরবিরহিনী নারীর দুঃখের বারমাস্যা।

> "সোনার তরী রঙের বাদাম দিয়াছ উড়াইয়া / পূবালি বাতাসে বাদাম উড়ে রইয়া রইয়া। / রঙ দেখিয়া এই অভাগী কান্দে ঘাটে বইয়া / সোঁতের টানে কলসি আমার গেলরে ভাসিয়া / আইস আইস সুজন নাইয়া, কলসি দেও ধরিয়া। / কী ধন লইয়া যাব ঘরে শূন্য আমার হিয়া।"[১৭]

স্বামীহীন নারীর খড়কুটোর মতো আঁকড়ে থাকা আশ্রয়টুকুও যে ফুরিয়ে যায়, তাইতো সাহায্যকারী সুজনের কাছে এই কাতর অনুরোধবাণী। কিংবা অনিত্য জীবনের কথা উঠে আসে বাউলির গানের সুরে। 'তুই যাস না রে মন পাখি তুই ফিরা আয়, / ওরে শুক-সারি নামে পাখি আয় হৃদি পিঞ্জিরায়।'

মানুষ জানে এ পার্থিব জীবনে একদিন অন্তকাল আসবেই কিন্তু এই নিষ্ঠুর সত্যকে মেনে নিয়েও জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিযোগিতা প্রেম কাম তৃষ্ণা এই জাগতিক চাহিদাগুলো মানুষের জীবনকে স্বাভাবিক ছন্দে ধরে রাখে। বরং বলা ভালো ভুলিয়ে রাখে নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি হতে।

তাছাড়া ঐহিক জীবনে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের যে বহুমাত্রিক বিন্যাস তাও লক্ষনীয়। শাসক ক্ষমতার কেন্দ্রে যিনি আছেন তার সঙ্গে অধীনস্থদের সম্পর্ক যে কেবল হুকুম তামিল করার সেটা উপন্যাসের শুরুতেই রাজার সঙ্গে ধনপতির সাক্ষাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাছাড়া ধনপতির যাত্রাকে কেন্দ্র করে পরিচিত-অপরিচিতর রক্তের-সম্পর্কের, দূর-সম্পর্কের যে ছন্দময় বিস্তার আমরা দেখি তা যে অতিথি বৎসল বাংলার একান্ত নিজস্ব সম্পদ। ঔপন্যাসিক বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে তার সমস্ত অভিব্যক্তিসহ তুলে এনেছেন। এ যেন একসর্থে জাতির উত্তরাধিকার সূত্রে সেই পরম্পরাকে বহন করে নিয়ে চলা। এক্ষেত্রে প্রসঙ্গ ভিন্ন হলেও মননগত ভাবনার বাহক হিসেবে সাদৃশ্য বহন করেছে এমন একটি উদ্ধৃতির উল্লেখ প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে। বাঙালির ইতিহাসকার নীহাররঞ্জন রায় তাঁর গ্রন্থের নিবেদন অংশে বলেছিলেন, -

> "আমার বাঙলাদেশ ও বাঙালি জাতি প্রাচীন পুঁথির পাতায় নাই, রাজকীয় লিপিমালায়ও নাই, সে-দেশ ও জাতি আমার চোখের সম্মুখে ও হৃদয়ের মধ্যে বিস্তৃত ও বিচরমান। প্রাচীন অতীত আজিকার সদ্য বর্তমানের মতোই আমার কাছে সত্য ও জীবন্ত। সেই সত্য জীবন্ত অতীতকে আমি ধরিতে চাহিয়াছি এই গ্রন্থে, মৃতের কঙ্কালকে নয়।"[১৮]

উপন্যাসের সূচনা এবং সমাপ্তি মূল অন্তর্বস্তুকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আলোচ্য 'ধনপতির সিংহলযাত্রা' উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই একটি অনির্দেশ্য যাত্রার কথা রয়েছে। তাই আক্ষরিক অর্থে এখানে কোনও মিলন বা তথাকথিত সমাপ্তি আশা করা যায় না। যাত্রার গতিপথটাই অভিপ্রেত, গন্তব্যের স্থায়ী ঠিকানা নয়। তাই আমাদেরও মনে প্রশ্ন জাগে কেনই বা ঔপন্যাসিক এমন একটি অপূর্ণতা নিয়ে সমাপ্তির রেখা টানলেন? তার একটি কারণ তো নিশ্চিতই যাত্রা পথের বর্ণানাই লেখকের আকাঙ্খিত বিষয় ছিল কিন্তু তাতে মঙ্গল-কবির অভিপ্রেত সত্য পূর্ণতা পেল কী? বণিক শ্রেষ্ঠের দ্বারা অনার্য নারী দেবতার পূজার মাধ্যমে স্বীকৃতিদান- এটাই তো মূল কাব্যের নিহিতার্থ ছিল। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের পুরোনো ছাঁচে নতুন সময়ের কথাকার মানুষের ভেতরের অপ্রতিরোধ্য কামনা-বাসনা প্রতিবাদের আকাঙ্ক্ষাটিকেই বড়ো করে দেখাতে চাইলেন। উপন্যাসের একেবারে শেষমুহূর্তেও ধনপতি সওদাগরকে আমরা দেখলাম দেবীর মায়ায় সে সিংহলরাজকে কমলেকামিনী রূপ দেখাতে অসমর্থ হলো; ফলে তার কপালে যে রাজরোষে বন্দিদশা ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই বিপদের মুহূর্তেও কিন্তু সে এই সিদ্ধান্তে অনড় রইল দেবীর কমলেকামিনী রূপই সবচেয়ে মোহময়। এখানেই তার মানবিক আবেদনের চিত্র ফুটে ওঠে। প্রকৃতির আশ্চর্য সৃষ্টি মানুষই একমাত্র প্রকৃতির রহস্যকে জানার অদম্য পণ করেছে এবং সংগ্রাম করেছে সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। এ উপন্যাসে আমরা দেখি ধনপতির সংগ্রামী প্রতিবাদী সত্তাকে। যদিও তার এই সংগ্রাম নিষ্ফলা ছিল কিন্তু অবশ্যই প্রশংসনীয়।

> "ধনপতি বলে, বাক্ শক্তি হরণ এর পূর্বে বলবো একটিই কথা, শতরূপা চণ্ডীর শ্রেষ্ঠ রূপটি হলো কমলে কামিনী। অধর যেন পক্ক বিম্বিকাফল, বদন শরদ-ইন্দু, আঁখি কুরঙ্গলোচন, কী নয়নাভিরাম দুই কুচগিরি, নিবিড় নিতম্ব। এরূপ পূজ্য হবে কেমনে?"[১৯]

এখানে ধনপতির দৃষ্টিতে চণ্ডীর দৈবী মহিমার বদলে চির মোহময়ী মানবী রূপটির প্রকাশ ঘটেছে। মূলকাব্যে যেখানে সর্বগুণান্বিত পুত্র শ্রীমন্তের আগমন ঘটে পিতার বন্দীমোচনে এবং দেবীর অভিপ্রায়েই সবকিছুর শুভ সমাপন ঘটে। কিন্তু এখানে ঔপন্যাসিক এক দীর্ঘ প্রতীক্ষায় উপন্যাসের ইতি টানেন। আমরা দেখি সর্বদা পরিবর্তিত সময় থেমে থাকে না। ঋতুচক্রের পরিবর্তনে সিংহল দেশ আবারও পত্র-পুষ্পে সুশোভিত। অর্থাৎ সুসময় এবং দুঃসময় একটি অপরটির পরিপূরক। কোনও কিছুই স্থায়ী নয়। তাই বিপদে ধীর-স্থির থেকে অবস্থার মোকাবিলা করে যাওয়াটাই যথার্থ মানুষের

লক্ষণ। এভাবেই ভোগ-ত্যাগ-দৃঢ়তা-মায়া-প্রেম-কামনা-বিরহ-বিচ্ছেদ-মিলন সব ভাবেরই সম্মেলক প্রকাশে উপন্যাসের কথাবীজ ভারতীয়ত্বের অখণ্ডতার বোধকেই ধারণ করে এগিয়ে চলে। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

> "ভারতীয় কথনকথার কালসীমা ত্রিকালবিস্তৃত, চলাচল ত্রিলোকব্যাপ্ত। কত না চরিত্র তাতে দেবদেবী নারী-পুরুষ থেকে অজস্র পশুপাখি ভূত-পেত্নী দৈত্যদানব। কি বৈচিত্র্যময় তার পটভূমি-সমুদ্র, পাহাড়, তৃণভূমি, মরু প্রান্তর, দীপ, অরণ্য। ভারতীয় কথনকথার পাঠ যেন এই দেশকেই আবিষ্কার করা, সুদূর অতীত থেকে এই বর্তমানেও।"[২০]

তথ্যসূত্র :

১. ভৌমিক, তাপস (সম্পাদক), 'কোরক' (প্রাক্ শারদ সংখ্যা), বাগুইআটি, কলকাতা, ১৪১৫, পৃ. ১৬৬
২. মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, 'গল্পসমগ্র' (গাঁ-ঘরের কথা), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৯, ভূমিকা অংশ
৩. মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, 'ভারতজোড়া কাব্যগাথা' [প্রবন্ধ - স্বদেশের পদ ও পংক্তিমালা (প্রবেশক)], মিত্র ও ঘোষবলিশার্স, কলকাতা, ১৪২৪, পৃ. ৪৯
৪. মল্লিক, দীপঙ্কর ও মল্লিক, দেবারতি, 'কথাযাত্রার তিন দশক', দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ২৫১
৫. মণ্ডল, পারমিতা, 'রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য : শিল্পরূপের নিরীক্ষা' (গবেষণা পত্র), [একান্ত ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার], বাংলা বিভাগ, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮, পৃ. ১৫
৬. রায়, দেবেশ, 'উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ২২
৭. সেন, অঞ্জন এবং অন্যান্য (সম্পাদক), 'বাংলার উত্তর আধুনিক সাহিত্য চিন্তা', [প্রবন্ধ – ঔপনিবেশিকতার স্বরূপ : উত্তর আধুনিকতা, এজাজ ইউসুফী], গাঙ্গেয় পত্র, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১০০
৮. রায়, দেবেশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৯. তদেব, পৃ. ১৬-১৭
১০. সেন, অঞ্জন এবং অন্যান্য (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪
১১. তদেব, পৃ. ১৩৮
১২. মল্লিক, দীপঙ্কর ও মল্লিক, দেবারতি, প্রাগুক্ত, [প্রবন্ধ - বঙ্গ সংস্কৃতির শিল্পপট : মঙ্গলকাব্য ও একটি অনবদ্য উপন্যাস, সুমিতা চক্রবর্তী], পৃ. ১৯৭
১৩. মল্লিক, দীপঙ্কর ও মল্লিক দেবারতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১
১৪. মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, 'ধনপতির সিংহলযাত্রা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৪, পৃ.২০-২১
১৫. তদেব, পৃ. ২৯
১৬. তদেব, পৃ. ৭০
১৭. তদেব, পৃ. ৮৬
১৮. রায়, নীহাররঞ্জন, 'বাঙালির ইতিহাস : আদি পর্ব', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০২, নিবেদন অংশ
১৯. মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, 'ধনপতির সিংহলযাত্রা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১
২০. মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, 'ভারতজোড়া কথনকথা' [প্রবন্ধ - স্বদেশের কথা ও কাহিনী], মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. (জ)